



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 58 - 64

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

ব্রাত্য বসুর ‘থিয়েটার বিষয়ক কবিতা’ : এক অভিনব সৃষ্টির উদ্ভাসন

সৌমিলি দেবনাথ

গবেষক, বাংলা বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID : soumili.debnath99@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Construction,
Perception,
Unenlightened world,
Prompter,
Communication,
Stage, The dialogue,
Poetry.

Abstract

The greatest power of Bratya Basu's poetry is his extraordinary ability to create an easy-to-understand connection with the reader, that is, his extraordinary ability to create communication. Bratya Basu wants to show the reality of modern theater, even the hero and heroine on the bright stage, the dazzling costumes, the villain's cruel smile, the blatantly incorrect dialogue; yet the audience in the auditorium bursts into laughter and tears, creating a strangely exciting world. But on the other hand, the person who is prompting, his realistic picture. The prompter wore loose pajamas and a fatwa. In winter, he wore a muffler, slippers and glasses. All in all, no one before Bratya Basu could describe the neglected life of the prompters in such a way.

Discussion

সাধারণ অর্থে সংলাপ-আশ্রয়ী একটি বিশেষ উপস্থাপন শিল্পের নাম নাটক। প্রাচীন ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রে এই নাটককে ভরতমুনি বলেছিলেন ‘লোকবৃত্ত্যানুকরণ’। অর্থাৎ ‘লোক’ বলতে সাধারণ মানুষ এবং তাদের জীবনের নানা গুণ-পড়ার সার্থক রূপায়ণ। এই প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে তিনি ট্রাজেডি নাটক সম্পর্কে তাঁর ‘কাব্যতত্ত্ব’-এ বলেছিলেন, এই অনুকরণ ঠিক ছব্ব অনুকরণ নয়। কারণ —

“মহাকাব্য, ট্রাজেডি, কমেডি এবং দিথুরাম্ব-কাব্য, বাঁশি বাজানো, কিথারা বাজানো— এই সব-
কিছুই সাধারণভাবে বলা চলে অনুকরণ। এরা (অবশ্য) পরস্পরের থেকে তিনভাবে পৃথক, হয়
তাদের মাধ্যমে, কিংবা বিষয়বস্তুতে কিংবা অনুকরণের রীতিতে।”^১

আসলে নাট্যকার যেটা অনুকরণ করেন, তার সঙ্গে মিলেমিশে থাকে অনেকখানি নাট্যকারের কল্পনা এবং সেইসব অনুভূতিগুলি, যেখানে কি ঘটে গেছে সেটা নয়, কি হতে পারে এমন একটা অনুভবের আবেশ। সেই সূত্রেই পুরনো দিনে প্রাচীন ভারত কিংবা গ্রিসে যে নাটকগুলি লেখা হয়েছিল, তার উত্তরাধিকার নিয়ে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে নতুন ধরনের কাল-উপযোগী নাটক লেখবার একটা প্রবল উৎসাহ।

ইংল্যান্ডে শেক্সপীয়র যেমন তাদের নাটককে নিয়ে গিয়েছিলেন একটা অসাধারণ উচ্চতায়; ঠিক তেমনি আমাদের বাংলাদেশে কখনো গ্রিক নাট্যকলা এবং কখনো বা শেক্সপীয়রের পাঁচ অঙ্কের নাটক লেখা হয়েছে। কখনো বা পুরাতন সেইসব নাটককে আধুনিক বিনির্মাণের আধারে আধারিত করে রচিত হয়েছে আরও নতুন নতুন নাটক। যেমন, শম্ভু মিত্র লিখেছেন মনসামঙ্গল কাব্যের একটা নতুন বিনির্মাণ— ‘চাঁদ বণিকের পালা’, রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী লিখেছেন ‘ফুল্লকেতুর পালা’ এবং শাঁওলি মিত্র লিখেছেন ‘নাথবতী অনাথবৎ’ ইত্যাদি নাটকগুলি। এই নাটকগুলির প্রাসঙ্গিকতা কিংবা উৎকর্ষ সম্পর্কে কতখানি বিতর্ক রয়েছে সেসব আলোচনায় না গিয়ে, আধুনিক বাংলা নাট্য সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট ও নাট্যকার ব্রাত্য বসু তাঁর ‘ভয়’ শীর্ষক কবিতাটিতে লিখেছেন—

“সেই তো বিষাদগাথা প্রাথমিক শিক্ষা পাওয়া শুরু।
যদি বলো বিনির্মাণ নির্মাণে দেখেছি বাঁকা ভুরু।।
যত বলি নিজের কথা বালিকাটি ভাবে প্রগলভতা।
জম্বুবনে রাধাকৃষ্ণ ক্রীড়া ভুলে হাবিজাবি কথা।। ...
মধ্যবয়সে এই গূঢ়তত্ত্ব নত্বষত্ব জ্ঞান।
সমস্ত সামাজিকতা কেন খানখান।।
অতঃপর ফিরে আসা হয়ে উলোঝুলো।
কমবয়সী নগ্নতায় মাখামাখি ধুলো।”^২

নাটকের ক্ষেত্রে নির্মাণ কিংবা এই বিনির্মাণের খেলা ‘হাবিজাবি কথা’, ‘নগ্নতায় মাখামাখি ধুলো’ কিংবা ‘উলোঝুলো’ কোনো ব্যাপার কিনা, এটা খুব স্পষ্ট করে ব্রাত্য বসু কোথাও একটি শব্দ উচ্চারণ করেননি। কিন্তু মধ্য বয়সে তিনি উপলব্ধি করেছেন বাঙালির জীবনের সবচাইতে বড়ো সংকট সামাজিকতার ক্ষেত্রগুলি খান খান হয়ে গেছে।

ব্রাত্য বসু নামটি শুনলেই প্রথমেই যে একটি ছবি চলে আসে, সেখানে তাঁর পরিচয় তিনি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা বিষয়ক মন্ত্রী। প্রশাসনের কাজে চূড়ান্ত ব্যস্ত থাকলেও ইতিহাস বলে তিনি একজন ডাকসাইটে অধ্যাপক ও নাট্যকর্মী বটে। তাঁর লেখা ‘অশালীন’, ‘অরণ্যদেব’, ‘শহরইয়ার’, ‘উইঙ্কল্-টুইঙ্কল্’ এবং ‘চতুষ্কোণ’— এর মতো নাটকগুলি বাংলা নাট্যমঞ্চ কাঁপিয়ে তুলেছে। শুধু নাটক লেখা নয়; তিনি ব্রিটিশ নাট্যকার গ্যারিক কিংবা বাঙালি নাট্যকার গিরিশ ঘোষের ন্যায় অভিনয়ের মঞ্চেও অত্যন্ত দাপটের সঙ্গে তাঁর ভূমিকা পালন করেছেন। নাটক লেখার পাশাপাশি তিনি একজন কবিও বটে। সেক্ষেত্রে কবিতার বিষয় নির্বাচনে তিনি অসামান্য একটা অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর ‘থিয়েটার বিষয়ক কবিতা’ শীর্ষক কাব্যগ্রন্থটিতে। শুধুমাত্র নাটক এবং নাটক বিষয়ক নানা ক্ষেত্র নয়, তার সঙ্গে বেশ কয়েকজন নট ও নাট্যকারদের নিয়ে লেখা ব্রাত্য বসুর কবিতাগুলি ও তার পরিকল্পনা বাংলা কাব্য-কবিতার ইতিহাসে একটা অভিনব সংযোজন বলা যেতে পারে।

সমগ্র কাব্যগ্রন্থটিতে মোট ২২টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। এই কবিতাগুলিকে তাদের বিষয়-বৈচিত্র্যে মোট তিনটি ধারায় বিভক্ত করা যেতে পারে। সেগুলি যথাক্রমে—

- (ক) একেবারে সরাসরি নাটকের সঙ্গে যুক্ত বিষয়ে অনুসারী কবিতা;
- (খ) তাহাদের কথা, অর্থাৎ কয়জন বাঙালি নট ও নাট্যকারদের স্মরণ বিষয়ক কবিতা এবং
- (গ) কাব্য এবং অন্যান্য বিষয়ক কবিতা।

উইকিপিডিয়া থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে জানা যায় যে, ব্রাত্য বসু ‘গণকৃষ্টি’ নামক একটি থিয়েটার দলে একদা সাউন্ড অপারেটর হিসাবে নাট্য জগতে প্রবেশ করেন। আর সেই সূত্রে তিনি আলোকিত মঞ্চ নয়; তার নেপথ্যে যে একটা বিপুল অনালোকিত নাটকের আরও একটা জগৎ আছে, সেই জগতের উপর আলোকপাত করেছেন। সেক্ষেত্রে তাঁর ‘প্রম্পটার’ কবিতাটিতে দেখা গেল, ব্রাত্য বসুর দু’চোখে দেখা সেই জগৎটার একটা বাস্তব ছবি। যেখানে তিনি উত্তম পুরুষে এ কবিতার ভাষ্য রচনা করে হয়তো নিজেই একবার ফিরে দেখতে চেয়েছেন—

“আমার দায়িত্ব আজ প্রম্পটারের।
অভিনেতার যা যা সংলাপ বলবেন।
আমি আজ তা পাখিপড়ার মতো করে বলে যাব।
অভিনেতার যা যা ভুলে যাবেন,
আমি আজ তা যত্ন করে ধরিয়ে দেব।
আমার নাম আজ তাই সাটবাবু।
সাত ধরে একা দাঁড়িয়ে থাকব উইংসের আড়ালে। মাথার ওপরে জ্বলবে
৫০ পাওয়ারের বাল্ব,
নায়কের গরম গরম সংলাপে যখন মুখর হয়ে উঠবে অডিটোরিয়াম,
নায়িকার মুছো যাওয়া অভিনয়ে যখন কেঁদে ককাবে দর্শক,
ভিলেনের ত্রুর হাসি দেখে যখন ভয় পাবে বত্তামিজ শিশু,
আমি নির্বিকার মুখে ৫০ পাওয়ারের বাল্বের নীচে সাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকব।”^৭

লক্ষণীয় এই কবিতাটিতে বারংবার ‘৫০ পাওয়ারের বাল্ব’ এই শব্দটি ফিরে ফিরে এসেছে। যার মধ্য দিয়ে কবি ব্রাত্য বসু দেখাতে চেয়েছেন— আধুনিক থিয়েটারের হাল-হকিকত, এমনকি আলো-বালমলে স্টেজের উপর নায়ক-নায়িকা, বালমলে পোশাক, ভিলেনের ত্রুর হাসি, চোখা চোখা ভুল সংলাপ; তবুও অডিটোরিয়াম ভর্তি দর্শকের দল হেসে-কেঁদে সে একটা অদ্ভুত উত্তেজনাময় জগৎ। কিন্তু তার উল্টো দিকে যিনি প্রম্পট করছেন, তাঁর বাস্তবোচিত ছবি, সেই প্রম্পটারের পরনে ঢোলা পাজামা আর ফতুয়া। শীতকাল হলে গলায় মাফলার, পায়ে কাবলি জুতো আর চোখে ধুসো চশমা। সব মিলিয়ে প্রম্পটারদের এই উপেক্ষিত জীবনের কথা ব্রাত্য বসুর আগে এমন করে আর কেউ বলতে পারেননি।

একটু নিবিষ্টভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, শব্দটা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্রাত্য বসু সহজ-সরল এবং হাল আমলের চলতি বাংলা ব্যবহারে করেছেন। যেমন ‘বুল পরিচালনা’, ‘ধুল অভিনয়’ ইত্যাদি শব্দসমূহ। আসলে যে কোনও কবিতার সার্থকতা নির্ভর করে, এইরূপ শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যদি সেই কবি খুব সহজে তাঁর পাঠককে স্পর্শ করতে পারেন। তখন কবি এবং সেই পাঠকের পারস্পরিক বোঝাপড়ার এই ক্ষেত্রটিকে একটা ভালো ‘কমিউনিকেশন’ (Communication) বলা যেতে পারে। ভালো কবিতার এই একটা শর্ত কমিউনিকেশন সম্পর্কে অধ্যাপক কুন্তল চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

“ ‘পাঠক’ শব্দটিকে আমরা যেভাবেই দেখতে চাই না কেন, কোনো একটি সরলীকৃত একমাত্রিক আইডেনটিটি রূপে তাকে বোঝার যতই সমস্যা থাক না কেন, পাঠককে বাদ দিয়ে তো কবির অস্তিত্বই ভাবা দুষ্কর। অন্যান্য রূপের মতো কবিতারও ভোক্তা পাঠকই। তাদের উপভোগ ও মূল্যায়নের সূত্রেই কবির স্বীকৃতি ও জনপ্রিয়তা। কোনো নির্দিষ্ট পাঠকবর্গের প্রতি কবির দায়বদ্ধতা থাক বা না থাক, পাঠক মনোরঞ্জনের অভিপ্রায়ে তিনি চালিত হোন বা না হোন, কবির প্রকৃত বিচার পাঠকেরই দরবারে।”^৮

এই কাব্যে ব্রাত্য বসুর কবিসত্তার সবচেয়ে বড়ো ক্ষমতা পাঠকের সঙ্গে তাঁর এই অসাধারণ একটা সহজবোধ্য যোগাযোগ অর্থাৎ কমিউনিকেশন নির্মাণের অসাধারণ দক্ষতা। যে দক্ষতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন তাঁর ‘মেক-আপ’ শীর্ষক কবিতাটিতে। নাটকের সঙ্গে যারা যুক্ত, তারা নিশ্চয়ই জানেন যে, কোনো অভিনয়কে বাস্তবোচিত করে তোলবার জন্য অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মেক-আপের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। কখনো কখনো দেখা যায়, অভিনেতা-অভিনেত্রী সেই মেকআপের মধ্য দিয়ে নাটকের চরিত্রটির সঙ্গে কখন যেন একাকার হয়ে যায়। সেই মেক-আপ নিয়েও ব্রাত্য বসু কবিতা লিখেছেন একেবারে সাধারণ ভাষায়—

“শো-এর পর আজ আর মেক-আপ উঠছে না।

ব্রাশ চালালাম বেশ ক'বার।
জল দিয়ে মুখ ধুলাম বেসিনের সামনে।
ফাউন্ডেশন উঠল না।
প্রাইমার বেসিকে এতটুকু টাল খেল না।
চোখে বারবার জল ছেটাতে কাঁড়িখানেক নোনতা জল বেরোল খালি,
কৃষ্ণকাজল ধেবড়ে গেল না।
নারকেল তেল আর স্নো মিশিয়ে,....
দু'দিনের না-কাটা কড়া দাড়ির ওপর.....
দেখলাম এমনকী নাকের চেরিফলের মতো টুকটুকে
পিং-পং বলটি পর্যন্ত অবিকৃত আছে।
শো-এর পর আজকাল আর মেক-আপ ওঠে না।”^৫

যা কখনোই পাঠকের কাছে কোনো দুর্বোধ্য কবিতার কোনো আবেশ নিয়ে আসে না; বরং তা সাধারণ পাঠককেও থিয়েটার ও তার অন্দরমহল সম্পর্কে যথেষ্ট কৌতূহলী করে তোলে।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘অলীকবাবু’ একটি উল্লেখযোগ্য এবং যুগান্তকারী নাটক বটে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর এই নাটকটি লিখেছিলেন ফরাসী লেখক মরলিয়ারের ‘La Tartuffe’ অবলম্বনে। নায়ক অলীকবাবু। তাঁর সম্পর্কে অধ্যাপিকা শকুন্তলা দাস লিখেছেন—

“অলীকবাবু চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর মিথ্যাভাষণ। মিথ্যা বলায় তাঁর জুড়ি নেই। এত মিথ্যা, মাঝে মাঝে তাঁরও গুলিয়ে যায়... তাঁর বাবা সামান্য সেরেস্তেদারির কাজ করে, কোনোক্রমে সংসার চলে... অলীকবাবুর মনের মধ্যে এমন এক হীনমন্যতা কাজ করে যে সে শুধু মিথ্যা কথা বলা অভ্যাস বলেই মিথ্যা বলে তা নয়, নিজের হীন অবস্থাটাকে মানতে পারে না বলেই নিজেকে এমন করে জাহির করে।”^৬

ব্রাত্য বসু ‘কুনাট্যের অলীকবাবুরা’ শীর্ষক কবিতাটিতে এই ধরনের মানুষ, যারা নাটকের সঙ্গে যুক্ত, তাদেরকে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বিভিন্ন অবলা জন্তুর অনুষঙ্গে একটা অসাধারণ আঙ্গিকে মোট সাতটি স্তবকে বিন্যস্ত করেছেন। তার মধ্যে চারটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা গেল—

- ক) “শৃগালটি দূর আখখত থেকে এসে আমাকে জানাল সে খুব দুঃখী,
তদুপরি সে বড় ডিজাইনার।
দু'দিন পর তার ঘোমটাপরা সরু লাউডগাকে নিয়ে চলে গেল শৃগাল,
পাটখতে কাঁঠাল চিবুতে।”^৭
- (খ) “মাথার ওপর অল্প লোম
থেকে থেকে গাল চুলকোয়
কথা বললেই গলা কমজোর।
কী বলব ওকে?
শিম্পাঞ্জি না বানর?”^৮
- (গ) “সুইডিয়ো থেকে বেরোল হস্তদন্ত হয়েনা।
থিয়েটারের শো-শুরু সেই সাড়ে ছ'টায়।
হাতে এখনও ঘণ্টাচারেক সময় আছে।
শুটিং আজ ছুটি দিয়েছে কোটিং গুটিং।”^৯

(ঘ) “সকলেই জানত নেড়িটি জাতধর্মে নেড়ি হলেও
হাইব্রিড। ফলত বনেদি।
তাই নেড়ির গুঁরসে অ্যালসেশিয়ান আর ডালমেশিয়ান
জন্মালে পর, কেউই প্রায় অবাক হল না।”^{১০}

এছাড়াও কুনাটোর অলীকবাবুদের ব্রাত্য বসু কখনো ‘খাজা-পুরুষ পরিচালক’, তাদের বিরুদ্ধে ‘মি-টু’ আন্দোলন এবং কখনো স্টুডিও থেকে বেরিয়ে আসা ‘অধর্মের ষাঁড়’ এবং সেইসব হাইব্রিড মানুষগুলির কথা বলেছেন, যারা ধর্মে ‘নেড়ি’ হলেও ফলত বনেদি। এদের গুঁরসে অ্যালসেশিয়ান, ডালমেশিয়ান জন্মালে কোনো অবাক হবার কারণ নেই বলে ব্রাত্য বসু জানিয়েছেন। বলা চলে, তিনি রূপকের মধ্য দিয়ে নাটক ও সিনেমা জগতের বাস্তবতাকে একটা অসাধারণ নিপুণতায় ফুটিয়ে তুলেছেন—

“বেজামণির নির্বন্ধাতিশ্যে আমার লেখা নতুন নাটকটি নিয়ে বড়বাবুর কাছে বুক টিপটিপ করতে করতে গেলাম। আমার লেখা এই নতুন নাটকটির নাম ‘প্রলয়লহরী’... ‘দূর থেকে চলন্ত ট্রামের জানালা থেকে উঁকি মেরে দেখলাম, তাঁর নিজস্ব সংঘারামে তাঁর ছত্রপলাশের মতো বিশ্বরূপাটচতের উঠোনে, আকাশ থেকে আচার্য ভরতের আঁজলা করে ঝরা বকুল আর গুলঞ্চফুল মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দ্যুতক্রীড়ক সম্রাট’।”^{১১}

ব্রাত্য বসুর ভাষা এবং কবিতাগুলির উপস্থাপন শৈলী অসাধারণ। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য তিনি বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের একজন কৃতি ছাত্র হওয়ায় নিশ্চিত আধুনিক শৈলী-বিজ্ঞানের সঙ্গে নিবিষ্টভাবে পরিচিত। তাইতো তাঁর এই গ্রন্থের কবিতাগুলির উদ্দেশ্য স্পষ্ট। সেই উদ্দেশ্যকে পূরণ করবার জন্য কবিতার বিষয় অনুসারে নিজের রচনা-রীতিকে বদলে নেওয়ার একটা চেষ্টা তাঁর রয়েছে, যেখানে পারস্পারিক সমন্বয় যে কোনো রচনার উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক অভিজিৎ মজুমদার লিখেছেন—

“রচনার উদ্দেশ্য বিষয়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে, তেমনি নির্ণীত হতে পারে লেখকের প্রতিক্রিয়া আর অনুভূতি মারফৎ। উদ্দেশ্য নিছক পাঠককে আনন্দদান হতে পারে। উদ্দেশ্য অনুসারে লেখকের রচনাশৈলীও যায় পাল্টে। অন্যদিকে নিজস্ব অনুভূতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে লেখক পাঠককে কোনো বিশেষ কাজে উদ্বুদ্ধ করতে চাইলে তাঁর রচনাশৈলী হয়ে ওঠে আরেকরকম।”^{১২}

এরপরেও এসেছে শম্ভু মিত্র, উপল দত্ত এবং অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ব্রাত্য বসুর জড়িয়ে থাকা অভিজ্ঞতাগুলির সঙ্গে তাঁদের প্রতি অসাধারণ একটা শ্রদ্ধার ক্ষেত্র। যেখানে ব্রাত্য বসু গদ্য এবং পদ্যের মধ্যবর্তী সীমাটাকে ভেঙেচুরে দিয়ে একটা অনন্য সাধারণ লিখন-রীতি নির্মাণ করেছেন। যে নির্মাণ-রীতি ব্রাত্য বসুর উদ্দেশ্য, প্রকাশ এবং পাঠকের সঙ্গে একটা সাবলীল কমিউনিকেশন গড়ে তোলার পক্ষে একটা বলিষ্ঠ দৃষ্টান্ত হতে পারে।

শিশিরকুমারকে ব্রাত্য বসু ‘একা রাজা’ রূপে চিহ্নিত করেছেন। আর শম্ভু মিত্র সম্পর্কে তিনি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার পর্ব-পর্বান্তরগুলি কখনো কবিতা কিংবা কখনো অসাধারণ পেলব গদ্যে যখন উপস্থাপন করেন, তখন কি একটা অসাধারণ আবেশ এসে পাঠককে মুগ্ধ করে। নাটক করতে গেলে চাই নলেজ। কলেজ কখনো প্রকৃত নলেজ দেয় না। নাটক করতে করতে সেটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপলব্ধ হয়। শম্ভু মিত্র যে একটা নলেজ এবং উৎকর্ষের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন, সেই বিষয়টি ব্রাত্য বসুর কলমে এই কবিতার শেষ অংশে অসাধারণ একটা নিবিড় আবেদনে ফুটে উঠেছে। তিনি লিখেছেন—

“আমার মনে হল আমি তো ঠিক ‘রক্তকরবী’-র রঞ্জন নই, আর আমার জীবনে কোনও নন্দিনীও
এখনও আসেনি, ফলে যদি রাজার বাতায়ন-এর যবনিকা উঠে গেলে, যদি দেখি রাজার পেছনে
পড়ে আছে আমারই মতো দেখতে সারি সারি স্বপ্নের মৃতদেহ।
নন্দিনীরা বাঁচে, রঞ্জনরা মরে।

সর্দাররা মরে, রাজা বাঁচে।

ফাগুলাল বাঁচে, বিষ্ণুপাগলরা মরে।

এই বিরাট হেঁয়ালি যে মুহূর্তে আমার সামনে তার অগ্নিবর্ণ রূপ নিয়ে প্রতিভাত হল, আমার গলা চিরে একটা আতঁকপঁ বেরিয়ে এল। একেই বোধহয় বলে আন্তোনিন আতঁোসুলভ আতঁমিশ্রিত আতঁনাদ।

আমি ছড়মুড় করে নেমে এলাম।

আমি নামতেই থাকলাম।

আমার সেই নামতে থাকা এখনও চলছে।

কারণ রাজা রাজাই থাকে।

ঘাতক থাকে ঘাতক।

আর পলাতক থাকে পলাতক।”^{১৩}

তবে উৎপল দত্ত সম্পর্কে যখন ব্রাত্য বসু কবিতা লেখেন, তখন যেমন উৎপল দত্তের অসাধারণ একটি নাট্য-নির্মাণ ‘কল্লোল’—এর কথা এসেছে; ঠিক তেমনি করে এসেছে শ্রীকর নন্দী, কানাহরি দত্তের পর মার্কসবাদের একটা অনুষ্ণ। আচমকা ব্রাত্য বসু লিখে ফেলেন—

“ ‘একটু অপেক্ষা করুন কমরেড, আমি নীচে আসছি’। সহাস্যমুখে উত্তর আসে।

১৫ সেকেন্ড।

৩০ সেকেন্ড।

১ মিনিট।

হঠাৎ দেখি দরজা খুলে গেছে। এবং উনি মার্কসপ্রণীত ‘ক্যাপিটাল’ দু’হাতে মাথার ওপরে তুলে আমার দিকে তেড়ে আসছেন। ঠিক যেন হলুদ রোদের মধ্যে ঝাঁপ দিল ডোরাকাটা সোনালি এক সিংহ। সিংহটি চিৎকার করছে, ‘সখি, কি অঙ্গ করো, তাই রঙ্গ করো দিবানিশি। আগে তিনটে বাংলা স, শ, ষ-এর উচ্চারণ করতে শিখুন, তারপর এইসব টিকরমবাজি শুনবো কমরেড’।”^{১৪}

ব্রাত্য বসুর এই কবিতাগুলিকে স্তুতিমূলক কবিতা বলা যায় কিনা, সে বিষয়ে একটা বিতর্ক থাকতে পারে। স্তুতিমূলক কবিতা সম্পর্কে হীরেন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

“নিউ ইংলিশ ডিকশনারির এই সংজ্ঞা অনুসারে তাহলে ওড প্রায়শই ছন্দোবদ্ধ এক ধরনের গীতিকবিতা যা কাউকে উদ্দেশ্য করে রচিত। বিষয়, অনুভূতি ও প্রকাশভঙ্গিতে একটা মহৎ কিছু বা উচ্ছ্বাস বর্তমান থাকে এরকম কবিতায়।...Gosse-ও বলেছেন প্রায় এই একই কথা, এই কবিতা হল “any strain of enthusiastic or exalted lyrical verse, directed to a fixed purpose, and dealing progressively with a dignified theme”.”^{১৫}

কিন্তু ব্রাত্য বসুর ‘তাহাদের কথা’ শীর্ষক কবিতাগুলি সন্দেহ নেই, সেরা বাঙালি চারজন নাট্যকারদের উদ্দেশ্যে লেখা। তবে গ্রিক কিংবা বহু বিবর্তনের ফলে আজকে যে ধরনের প্রথাগত ওড (ode) লেখা হয়ে থাকে, তার সঙ্গে ব্রাত্য বসুর এই স্তুতিমূলক কবিতাগুলির একটা বড়ো রকমের পার্থক্য রয়েছে। তাঁর কবিতায় এসেছে নাটকের জগতে বেনিয়া-রাজের ক্ষেত্রটি। যাকে নির্দেশ করতে ‘অজিতেশ’ শীর্ষক কবিতাটিতে তিনি লিখেছেন—

“পৃথিবীতে শিশুমন বাঁচিয়ে রাখার কোনও মানে হয় না।

তোমার সঙ্গে যাদের পৃথিবীর বাজারে দেখা হবে, তাদের অনেকেই প্রধানত সওদা করতে

এসেছে। মুৎসুদ্দির মনের সঙ্গে শিশুমনের সংঘাত অনিবার্য।”^{১৬}

এটা একটা অসাধারণ বাস্তবতার উপলব্ধি, যেখানে অধিক মুনাফা নাটকের ক্ষেত্রেও তার অগ্রগতিকে ছাই করে ছাড়ে।

ব্রাত্য বসুর ‘কাবাব’ শীর্ষক চারটি কবিতা রয়েছে। কবিতাগুলি উত্তম পুরুষে বর্ণিত। এই কবিতার বিষয় অসাধারণ। কিন্তু তার চেয়ে অসাধারণ এই কবিতাগুলির আঙ্গিক এবং উপস্থাপনের শৈলী। প্রথম কবিতাটিতে ‘আয়নায় ভাসমান ছুরি’, ‘পরানুখ পিকাসো’ এবং ‘নরশাবকের মাংস’ কোথায় যেন মিলেমিশে গিয়ে একালের একটা বাস্তবতাকে অকপটে চিনিয়ে দেয়। আর ‘কাবাব ২’-তে তিনি লিখেছেন—

“হে প্রিয়,
হে কীটদষ্ট থেমে থাকা শরীর
আমার করোটীর ভেতরে আজ কেন এত বিষণ্ণতা
আবার সেই বিরহ নামক স্থায়ীভাবে থেকে
করণরসের কেন এই অকারণ উদগমন।
চলো, চলো, বরং রক্তে শর্করা মেপে আসি আবার।”^{১৭}

‘কাবাব ৩’—এ কবিও যেন পাঁচিলের উপর থেকে চলে যাওয়া এক যাত্রী। যিনি বেগম আক্তারের গান শোনেন। আর ‘কাবাব ৪’—এ একেবারে একালের আধুনিকতা মূর্ত হয়ে উঠেছে মনজিনিস, পিরানদেল্লা, শ্লেম্মা ফুৎকার ইত্যাদির একটা যথাযথ ব্যঙ্গনায়। আর সেই বাস্তবতা এবং ব্যঙ্গনাতেই ব্রাত্য বসুর কবি-কর্মের যাবতীয় সার্থকতা ও সৌন্দর্য।

Reference:

১. অ্যারিস্টটল, ‘কাব্যতত্ত্ব’, অনুবাদ— শিশির কুমার দাস, প্যাপিরাস, ২০২৩, পৃ. ৩৯
২. বাত্য বসু, ‘থিয়েটার বিষয়ক কবিতা’, ‘ভয়’, সিগনেট প্রেস, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০২২, পৃ. ৫৫
৩. তদেব, ‘প্রম্পটর’, পৃ. ১৬
৪. কুন্তল চট্টোপাধ্যায়, ‘কবিতা ও আধুনিকতা’, পুস্তক বিপণি, ২০০৩, পৃ. ৬০
৫. বাত্য বসু, ‘থিয়েটার বিষয়ক কবিতা’, ‘মেক-আপ’, সিগনেট প্রেস, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর, ২০২২, পৃ. ৯
৬. শকুন্তলা দাস, ‘অলীকবাবু পুরুষ চরিত্র’, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অলীকবাবু, সম্পাদনা ও সংকলন— তপন মণ্ডল, দিয়া পাবলিকেশন, ২০২১, পৃ. ৯৩-৯৫
৭. বাত্য বসু, ‘থিয়েটার বিষয়ক কবিতা’, ‘কুনাট্যের অলীকবাবুরা ১’, সিগনেট প্রেস, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০২২, পৃ. ১০
৮. তদেব, ‘কুনাট্যের অলীকবাবুরা ২’, পৃ. ১০
৯. তদেব, ‘কুনাট্যের অলীকবাবুরা ৫’, পৃ. ১২
১০. তদেব, ‘কুনাট্যের অলীকবাবুরা ৬’, পৃ. ১৩
১১. তদেব, ‘শিশিরকুমার, তাঁহাদের কথা’, পৃ. ১৮-১৯
১২. অভিজিৎ মজুমদার, ‘শৈলীবিজ্ঞান এবং আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব’, দে’জ পাবলিশিং, ২০০৭, পৃ. ৪০
১৩. বাত্য বসু, ‘থিয়েটার বিষয়ক কবিতা’, ‘তাঁহাদের কথা ২ - শঙ্কুবাবু’, সিগনেট প্রেস, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০২২, পৃ. ২২
১৪. তদেব, ‘তাঁহাদের কথা ৩ — উৎপল ও ইন্দীবর’, পৃ. ২৩
১৫. হীরেন চট্টোপাধ্যায়, ‘সাহিত্য-প্রকরণ’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৪১৬, পৃ. ৫৮
১৬. বাত্য বসু, ‘থিয়েটার বিষয়ক কবিতা’, ‘তাঁহাদের কথা ৪ — অজিতেশ’, ২০২২, সিগনেট প্রেস, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০২২, পৃ. ২৫
১৭. তদেব, ‘কাবাব ২’, পৃ. ৪২